স্নাতকোত্তর বাংলা

দ্বিতীয় সেমেস্টার

কোর্স কোড : 204/2 (ক)

(বক্রোক্তি, ধ্বনি, রস)

Scanned with CamScanner

আমেরিকার নিও-ক্রিটিকদের পুরোধাপুরুষ আই. এ. রিচার্ডস্ তাঁর *Principles of Literary Criticism*-এ যখন শব্দের Scientific use এবং Emotive use এই দু'ধরনের ব্যবহারের কথা বলেছিলেন এবং কাব্যার্থের সম্যক উপলব্ধির জন্য জোরটা দিয়েছিলেন Emotive use-এর ওপর, আমাদের কাছে তখনও ফার্দিনান্দ দ্য স্যোস্যুর বিশেষ কোনো পরিচিত নাম ছিল না। যতদূর ধারণা, কাব্যসমালোচকদের জগতে Structuralism, Post-structuralism, Semiotics এবং শেষ পর্যন্ত Deconstruction কথাগুলো নিয়ে সমালোচকদের বহুক্রীড়া চলাকালেই স্যোস্যুর তাঁর অলিখিত সংলাপে যে বেশ কিছু মহামূল্য কথা বলেছিলেন সেদিকে নজর পড়েছে দুনিয়ার। স্যোস্যুর-উত্তর কালে এই সিদ্ধান্ত প্রায় সর্বজন-সমর্থিত যে, কাব্যবিচার প্রায়-অসম্ভব গঠনমূলক ভাষাতত্ত্বকে পাশ কাটিয়ে। ১৯৭৪-এ মিলান-এ 'International Association for Semiotic Studies'-এর প্রথম মহাসম্মেলন-এ জড়ো হয়েছিলেন ৬৫০ জন প্রতিনিধি, যাঁদের মূল আলোচ্য বিষয় ছিল 'Science of Signs'। 'শব্দ' যে চিহ্নক এবং চিহ্নিত হল 'বাচ্যার্থ' স্যোস্যুর-এর পর থেকে এই ব্যাপারটাই সমালোচকদের আবিষ্ট করল নানাভাবে। তারপর ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু প্রাজ্ঞজন দেরিদা'র নেতৃত্বে তুলকালাম আলোচনা শুরু করে দিলেন এই বলে যে, শব্দের অর্থ নয়, শব্দ থেকে নতুনতর শব্দের জন্মই হল মূল ব্যাপার। পূর্বের আমরা পরম বিস্ময়ে শুনলাম পশ্চিমের এই সব কথা। এমনতর বিস্ময় নিয়েই উলফগ্যাং ইসার-এর 'Reader response' তত্ত্ব পাঠ করলাম। কিন্তু কজন আর ভেবেছি যে ইসার-এর তত্ত্বের নির্যাস 'সহৃদয় সামাজিক' কথাটার মধ্যে ছিল? রিচার্ডস এবং তার বন্ধু অগডেন ধ্বনিবাদীদের ছাড়িয়ে যেতে পারেননি? অথবা, 'শব্দ', 'অর্থ' নিয়ে স্যোস্যুর থেকে দেরিদা যে যাই বলুন ভামহ, দণ্ডী বা কুন্তকের তত্ত্বকে ভুলিয়ে দেওয়া সম্ভব ছিল না তাঁদের পক্ষে? মনে হয় অতীতের পুঁজি ভাঙতে পারলে দেখা যাবে মিলছে এমন সব কথা যা উচ্চারণ করতে পশ্চিমের মনীষীদের সময় লেগেছে আরো হাজার বছর। অতীত-বিস্মৃতের পক্ষে অধমর্ণ হওয়া হয়তো সহজ, কিন্তু গৌরবময় ঐতিহ্যের বিস্মরণ সাংস্কৃতিক সন্নিপাতের আবশ্যিক কারণ (necessary condition)—ইতিহাস বারবার প্রমাণ করেছে এই সত্য। আমাদের প্রাচীন মনীষীরা যাঁদের 'সমালোচক' বলা হয় না, বলা হয় 'আলঙ্কারিক', 'শব্দ' এবং 'অর্থ' নিয়ে ভেবেছেন তাঁরা এবং বলেছেনও বিস্তর কথা। তবে বেশ কিছু বিশিষ্টজনের মধ্যে বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখেন রাজানক কুন্তক (কুন্তল?) তাঁর *বক্রোক্তিজীবিত* গ্রন্থের জন্য।

সময়ের হিসেবে অর্বাচীন টিলিয়ার্ড যখন বলেছিলেন, কবিতামাত্রই তির্যক তখন কিন্তু আসলে 'বক্রোক্তি' তত্ত্বই প্রতিপাদন করতে চেয়েছিলেন তাঁর মতো করে। কিন্তু এরকম দু'একটি বাক্যে নয়, 'বক্রোক্তি' কথাটা তত্ত্বগতভাবে কুন্তকের মতো সবিস্তার বলেননি কেউ। আজ থেকে অন্তত হাজার বছর আগে কুন্তক তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে আনন্দবর্ধনের ধ্বনিতত্ত্বকে গুরুত্ব না দিয়ে ভামহাচার্যের মতবাদকে নতুন ব্যাখ্যার আলোয় উদ্ভাসিত করলেন। কুন্তক কি পরিচিত ছিলেন ধ্বনিতত্ত্বের সঙ্গে? স্ফোট, ধ্বনি—এ সবের সঙ্গে তাঁর পরিচিতি অসম্ভব নয়, কিন্তু আনন্দবর্ধন, অভিনবগুপ্ত—এই দুইয়ের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রতীয়মানার্থের গৌরব না-জানা থাকা সম্ভব, কারণ অভিনবগুপ্ত তাঁর উত্তরকালীন।

ভামহ, দণ্ডী, বামন তথা কুন্তকের পূর্বাচার্যদের কাছে 'বক্রোক্তি' ছিল একটি মুখ্য

Scanned with CamScanner

শব্দালঙ্কার মাত্র। কিন্তু কুন্তক বক্রোক্তি-কে পৃথক করে নিলেন 'অভিধা-প্রকার-বিশেষ' রূপে গণ্য করে। সাধারণ অলঙ্কার বাহ্য আভ্যন্তর বা বাহ্যাভ্যন্তর যাই হোক না কেন, ধ্বনিবাদীদের আগে তা ছিল শব্দ ও অর্থে সীমাবদ্ধ। বক্রোক্তিও ছিল বিশেষ শব্দালঙ্কার মাত্র। আলঙ্কারিক রুদ্রট এবং মম্মট এই মতের পোষকতা করেছিলেন। তাঁরা অলঙ্কারকে 'কাকু' এবং 'শ্লেষ' এই দু'ভাগে ভাগ করে নিলেন। প্রথমটি নির্ভর করে উচ্চারণভঙ্গির ওপর এবং দ্বিতীয়টিতে বাহ্য অর্থ ছাড়াও থাকে অন্য একটি অর্থ। শ্লেষ নির্ভর করে অপভ্রংশ এবং গৌণার্থপ্রতীতির ওপর। ভামহ কিন্তু গুণ ও অলঙ্কার থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছিলেন বক্রোক্তিকে। ভামহ অতিশয়োক্তি অলঙ্কার প্রসঙ্গে 'বক্রোক্তি'র কথা বলেছিলেন, তথাপি তিনি বক্রোক্তিকে 'শব্দালঙ্কার' বলে গণ্য করেননি। ভামহ বিভিন্ন ধরনের অলঙ্কারের কথা বললেও হেতু এবং সূক্ষ্মকে অলঙ্কার বলে মানেন নি, কারণ এদের মধ্যে 'বক্রোক্তি' নেই। ভামহ মনে করতেন, অলঙ্কার মাত্রই বক্রোক্তি। তাঁর সিদ্ধান্ত হল মহাকাব্য, নাটক, কথা এবং আখ্যায়িকা সর্বত্রই বক্রোক্তি থাকা বাঞ্ছনীয় এবং বক্রোক্তি হচ্ছে লোকাতিক্রান্ত-গোচর বচন। 'লোচন' টীকায় অভিনবগুপ্তাচার্য বক্রতা বলতে বুঝিয়েছেন 'লোকোত্তীর্ণেন রূপেণাবস্থানম্'। 'লোকাতিক্রান্ত' বা 'লোকোত্তীর্ণ' বলতে তাঁরা বুঝিয়েছিলেন সেই জগতের ভাষাকে যা কিনা দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত ভাষা থেকে পৃথক। কুন্তকাচার্য ও তাঁর *বক্রোক্তিজীবিত*-র তৃতীয় উন্মেষের দ্বিতীয় কারিকায়, 'লোকোত্তিক্রান্ত গোচরা' কথাটা ব্যবহার করেছিলেন 'প্রসিদ্ধ ব্যাপারাতীত' অর্থে। দণ্ডী স্বভাবোক্তিকে 'আদ্যা অলঙ্কৃতিঃ' বা প্রথম কাব্যালঙ্কাররূপে উল্লেখ করে যাবতীয় অলঙ্কারকে বললেন—বক্রোক্তি। 'বক্রোক্তি' প্রসঙ্গে দণ্ডী বললেন :

শ্লেষঃ সর্বাসু পুষ্ণাতি প্রায়ো বক্রোক্তিষু শ্রুয়ম্।
দ্বিধা ভিন্নং স্বভাবোক্তির্বক্রোক্তিশ্চেতি বাঙ্ময়ম্।।

দণ্ডীর মতে, বাঙ্ময় কাব্য স্বভাবোক্তি এবং বক্রোক্তি এই দু'ভাগে বিভক্ত। আর বামনাচার্য রুদ্রটের মতোই বক্রোক্তিকে লক্ষণার দ্বারা রচিত অর্থালঙ্কার বলে চিহ্নিত করলেন। এইভাবে বক্রোক্তি শব্দটি ভামহ ও দণ্ডীর কাছে একরকম এবং বামন রুদ্রটের কাছে অন্য। কুন্তকের *বক্রোক্তিজীবিত*-এর তত্ত্বভিত্তি ছিল ভামহের সিদ্ধান্তে। *বক্রোক্তিজীবিত*-এর প্রথম উন্মেষের দ্বিতীয় কারিকায় কুন্তক লিখছেন :

লোকোত্তর চমৎকারকারিবৈচিত্র্যসিদ্ধয়ে।
কাব্যস্যায়মলঙ্কারঃ কোঽপ্যপূর্বো বিধীয়তে।

কারিকার প্রথম অংশের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে 'অসমান্যাহ্লাদ বিধায়িবিচিত্র ভাবসম্পত্তয়ে' অর্থাৎ অলঙ্কারের উদ্দেশ্য হল অসামান্য আনন্দদান। পরবর্তী কারিকার শেষাংশে বললেন 'কাব্যবন্ধোঽভিজাতানাং হৃদয়াহ্লাদকারকঃ' অর্থাৎ সর্গবদ্ধ কাব্যের লক্ষ্য হল অভিজাতদের হৃদয়ে আহ্লাদ বা আনন্দসৃষ্টি। 'অভিজাত' বলতে বৃত্তিতে বুঝিয়েছেন রাজপুত্র ইত্যাদি। ষষ্ঠশ্লোক পর্যন্ত অলঙ্কারের প্রসঙ্গ উত্থাপন করার পর সপ্তম কারিকায় কুন্তক বললেন :

শব্দার্থৌ সহিতৌ বক্রকবিব্যাপারশালিনি।
বন্ধে ব্যবস্থিতৌ কাব্যং তদ্বিদাহ্লাদকারিণি।

তৃতীয় কারিকায় অভিজাতদের হৃদয়ে আনন্দদানের মধ্যে কাব্য-সার্থকতা সন্ধান করা হয়েছিল। সপ্তম কারিকায় কুন্তক বললেন 'তদ্বিদ্'গণের আহ্লাদ সৃষ্টির কথা। নবমে তিনি পুনরায় ব্যবহার করলেন, 'সহৃদয়াহ্লাদকারিস্বস্পন্দসুন্দরঃ' কথাটি। সুতরাং বক্রতা ব্যবহারের লক্ষ্য হবে সহৃদয় পাঠকদের আনন্দদান। অর্থাৎ শুধুই বাহ্যসৌষ্ঠব বা চারুত্ব সৃষ্টির জন্যে নয়, পাঠকচিত্তে রসসৃষ্টির জন্যই কুন্তকাচার্য বক্রোক্তি ব্যবহারের কথা বলেছেন। সপ্তদশ কারিকায়

Scanned with CamScanner

শব্দার্থের এই অলৌকিকতা বিধানের জন্য তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন শব্দের বিন্যাসভঙ্গির ওপর। এই বিন্যাসভঙ্গি কেমন হবে? কুন্তক বলছেন, 'অন্যূনানতিরিক্ত মনোহারিণী পরস্পরস্পর্ধিত্বরমণীয়া'। বৃত্তিতে বলেছেন শব্দ ও অর্থের এই 'পরস্পরস্পর্ধিত্ব' এবং 'অন্যূনাতিরিক্তত্ব' সহৃদয়গণের প্রীতির কারণ হয়। সুতরাং বারংবার এই সত্যটি যেন কুন্তক-কর্তৃক প্রতিপাদিত হচ্ছে যে সহৃদয়ের প্রীতির কারণ হল ভাষার বক্রতা। এই 'বক্র' ব্যাপারটা কী সপ্তম কারিকার বৃত্তিতে সে কথা বললেন কুন্তক--'শাস্ত্রাদিপ্রসিদ্ধ শব্দার্থোপনিবন্ধব্যতিরেকী'। অষ্টাদশ কারিকার বৃত্তিতে কুন্তক বললেন, বক্রোক্তি হল শাস্ত্রাদিতে শব্দার্থের যে মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত তার থেকে ভিন্ন। মহিমভট্ট বলেছিলেন, বৈচিত্র্যসৃষ্টির জন্য প্রসিদ্ধ মার্গ পরিত্যাগ করে অন্যভাবে বলা হয় বলে তাকে 'বক্রোক্তি' বলা হয়। যদিও কবিমাত্রকেই প্রাচীন প্রতিষ্ঠিত শব্দার্থের প্রতি আকর্ষণ প্রকাশ করতে হয়, তথাপি নতুনত্ব সৃষ্টি ছাড়া কোনো কবি খ্যাতি লাভ করতে পারেন না। নতুনত্ব সৃষ্টি মানেই হল প্রচলিত মার্গ বা পন্থাকে বর্জন করে নতুন কিছু বলা। *বক্রোক্তিজীবিত*-এর প্রথম উন্মেষের দশম কারিকায় কুন্তক বলছেন, বক্রোক্তি হল 'বৈদগ্ধ্যভঙ্গিভণিতিঃ'। ব্যাখ্যায় বলেছেন--'বৈদগ্ধ্যং বিদগ্ধভাবঃ কবিকর্মকৌ শলং তস্যভঙ্গি বিচ্ছিত্তিঃ তয়া ভণিতিঃ বিচিত্রৈবাভিধা বক্রোক্তিরিত্যুচ্যতে'। অর্থাৎ কবির কাব্যরচনার যে বিশেষ ভঙ্গি বা কৌশল তাই হল বক্রোক্তি। রুয্যক একেই বলেছেন 'উক্তি বৈচিত্র্য'।

যে-বক্রোক্তির কারণ 'কবি-ব্যাপার' কুন্তকাচার্য তাকে ছ'ভাগে ভাগ করেছেন : ক. বর্ণবিন্যাস বক্রতা, খ. পদপূর্বার্ধবক্রতা, গ. প্রত্যয়াশ্রয় বক্রতা, ঘ. বাক্যবক্রতা, ঙ. প্রকরণ বক্রতা, চ. প্রবন্ধ বক্রতা।...প্রতিটি শ্রেণির বক্রতাকে তিনি যেভাবে আরো বিশ্লিষ্ট করেছেন তাতে আমেরিকান দার্শনিক চার্লস স্যান্ডার্স পিয়ার্স (Charles Sanders Peirce)-এর Semiotics তত্ত্ব সম্পর্কে জোনাথান কালার (Jonathan Culler)-প্রযুক্ত বিশেষণটি ব্যবহার করা যেতে পারে 'taxonomic speculatios'। অবশ্য *ধ্বন্যালোক*-এর কারিকাকারও ধ্বনির এই রকমই বিচিত্র ভাগ করেছিলেন। অথবা বলা যায়, ভারতীয় আলঙ্কারিকদের রচনারীতিগত বৈশিষ্ট্যই ছিল এই রকম। কিন্তু 'বক্র' শব্দটি কুন্তকাচার্য যেভাবে ব্যবহার করেছিলেন তা বুঝে নিতে পারলে বক্রোক্তির প্রাসঙ্গিকতা যে আজও গুরুত্বপূর্ণ তা একালের ভারতীয় সমালোচকেরা স্বীকার করে নেবেন। পশ্চিমের আলোতে পূর্বের দিগন্তকে চেনাই যখন আজ অনিবার্য এবং নিয়তিনির্ধারিত তখন ফার্দিনাদ দ্য স্যোস্যুর-পরবর্তী Srtuctural linguistics-এর সঙ্গে বক্রোক্তিবাদকে মিলিয়ে পড়া যেতে পারে। এমনকি যাঁরা Stylistics চর্চা করেন কুন্তক তাঁদেরও নিরাশ করেননি তাঁর *বক্রোক্তিজীবিত* গ্রন্থে।

Scanned with CamScanner

ধ্বনিবাদ

পারিভাষিকতার দৃষ্টিতে দেখলে 'ধ্বনি' শব্দটি আলঙ্কারিকদের সৃষ্টি নয়, যদিও পরবর্তীকালে আলঙ্কারিকদের অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয় হিসেবেই ধ্বনি শব্দটি চিহ্নিত হয়েছে। ধ্বনির সংজ্ঞা হিসেবে *কাব্যপ্রকাশ*-এর লেখক মম্মট লিখেছিলেন—যা নাকি শব্দের বাচ্য বা অভিধেয় অর্থের বাইরে অতিরিক্ত একটি অর্থ বোঝায় সেই ব্যঙ্গ্য অর্থকেই ধ্বনি বলে অভিহিত করেছেন পণ্ডিতেরা—ইদুমুত্তমমতিশয়িনি ব্যঙ্গ্যে বাচ্যাদ্ ধ্বনি বুধৈঃ কথিতঃ। এই পঙ্‌ক্তিতে 'পণ্ডিতেরা' বলতে বৈয়াকরণদের কথা স্মরণ করেছেন মম্মট। বৈয়াকরণেরা যে স্ফোটবাদের কথা বলেছেন, তার মধ্যেই যেহেতু ধ্বনির বীজটুকু সম্পূর্ণ ধরা আছে (দ্র. স্ফোট), তাই বৈয়াকরণরাই রসশাস্ত্রসম্মত ধ্বনিতত্ত্বের প্রথম প্রবক্তা বলে সম্মানিত হয়েছেন।

ধ্বনিতত্ত্বের সর্বকালীন তথা সর্বশ্রেষ্ঠ আচার্য হলেন *ধ্বন্যালোক*-রচয়িতা আনন্দবর্ধন। তিনি লিখেছেন—শব্দের অর্থ দু-রকম হতে পারে—বাচ্য এবং প্রতীয়মান। আমরা জানি—প্রত্যেক শব্দেরই একটা প্রসিদ্ধ লোকসম্মত অর্থ আছে। শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে যে-অর্থের বোধ হয় সেইটাই শব্দের মুখ্য অর্থ। অথবা সেটাই শব্দের বাচ্য অর্থ বা অভিধেয় অর্থ। গোরু শব্দ উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে লেজ-শিঙ্-গলকম্বলওয়ালা যে-জন্তুটির প্রতিভাস মনের মধ্যে ভেসে ওঠে, গোরু শব্দের মুখ্য তথা বাচ্য অর্থ সেটাই। যে শক্তির মাধ্যমে গোরু বলতে আমরা গলকম্বলওয়ালা প্রাণীটিকে বুঝি, শব্দের সেই শক্তিকে বলে অভিধা। অভিধা শক্তি দিয়ে আর যাই হোক, এর দ্বারা কোনো মহৎ কাব্য হয় না। অভিধা শক্তি কাজে লাগিয়ে, যতটুকু কবিতা হতে পারে, তার দৃষ্টান্ত বড় জোর—পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল / কাননে কুসুম-কলি সকল ফুটিল—এই পর্যন্ত।

শব্দের উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ যে-অর্থের প্রতীতি হয়, সেই বাচ্যার্থও কিন্তু তার চেয়ে বেশি অর্থ বোঝাতে পারে। যেমন, গোরু বলতে আমরা পূর্বোক্ত প্রাণী বুঝলেও একজন মাস্টারমশাই যখন ছাত্রকে গোরু বলেন, তখন নিশ্চয়ই তিনি তার লেজ-শিঙ-গলকম্বলের দিকে দৃষ্টি দিয়ে কথা বলেন না। কেননা সেই মুহূর্তে ছাত্রের নির্বুদ্ধিতা, জড়তা অথবা

Scanned with CamScanner

নিরুদ্যোগই তাকে গোরু হিসেবে চিহ্নিত করছে। তার মানে, এখানে গোরু শব্দটার একটা আলঙ্কারিক প্রয়োগ ঘটছে। আনন্দবর্ধনের 'বাচ্যার্থ' অনেকটা এইরকম। শব্দ এবং তার অর্থকে তিনি এতটা মন্দ বলেন না, যাতে শব্দের আক্ষরিক অর্থটুকুই সর্বস্ব হয়ে যায়। তিনি মনে করেন—অতি উত্তম কাব্যের অবলম্বন যেহেতু শব্দার্থই, অতএব শব্দের বাচ্যার্থও কাব্যের মাধুর্য তৈরি করতে পারে উপমাদি অলঙ্কার প্রয়োগের মাধ্যমে। নির্মল গ্রাম্য প্রকৃতির মধ্যে আস্তে আস্তে সন্ধ্যা নামছে—এই কথাটাকে যদি অভিধাবৃত্তি অতিক্রম করে কাব্যের বিষয় করে তুলতে হয়, তাহলে বলতে হবে—'নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা / সোনার আঁচল খসা' / অথবা 'সন্ধ্যাতারা ধীরে / সন্তর্পণে নদীতীরে / অরণ্যশিয়রে'।

এখানে উপমা এবং সমাসোক্তি অলঙ্কারের সার্থক প্রয়োগ ঘটায় সন্ধ্যাকালের প্রাকৃতিক পরিবর্তনটুকুর মধ্যে শব্দার্থের যেটুকু চমৎকারিত্ব তৈরি হয়েছে, তা বাচ্যার্থের মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে বলে আনন্দবর্ধন মনে করেন। উপমা ইত্যাদি অলঙ্কার প্রয়োগের মাধ্যমেও বাচ্য অর্থ কাব্যের পদবি লাভ করতে পারে। কিন্তু সে কাব্যও তেমন সরস বলা যায় না, কেননা কাব্যের প্রাণ হল ধ্বনি—যা শব্দের প্রতীয়মান অর্থের মাধ্যমেই প্রকাশ পায়। এ প্রসঙ্গে অবধারিতভাবে যে কথাটা আসবে সেটা ওই শব্দের শক্তির কথাই। শব্দের অভিধা শক্তির মাধ্যমে যেমন গোরু বলতে লেজ-শিঙ-গলকম্বলযুক্ত প্রাণীকেই বুঝি, কিন্তু শব্দের শক্তি বেড়ে গেলে, তার চেয়ে বেশি অর্থ প্রকাশ করা যেতে পারে। যেমন যদি বলি—আমি দক্ষিণেশ্বরে থাকি, তাহলে দক্ষিণেশ্বর শব্দের মুখ্যার্থে শ্রীরামকৃষ্ণের যে পূজাস্থান কালীমন্দির বোঝায়, আমি নিশ্চয়ই সেই কালীমন্দিরে থাকি না। কিন্তু থাকি এমন একটা জায়গায় যার সঙ্গে কালীমন্দিরের সংযোগ আছে, অথচ সেটা কালীমন্দিরও নয়। তাহলে শব্দের শক্তি কিন্তু বাড়ল। শব্দের এই বাড়তি শক্তির নাম লক্ষণা। যদি বলি—'কোনোদিন ছিলে নাকি মুকুলিকা বালিকা বয়সী'—তাহলে 'মুকুলিকা' বলতে নিশ্চয়ই এখানে স্ফুটনোন্মুখ কমলকলির কথাই শুধু ভাবব না। বরঞ্চ মুকুলিকার স্ফুটনোন্মুখতার ভাবটুকু বালিকা-বয়সীর সঙ্গে অন্বিত করে কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে থাকা এমন এক রহস্যময়ী রমণীর সন্ধান আমরা পেয়ে যাব মনে মনে, যা মুকুলিকা শব্দের অর্থ থেকে অনেক মধুর।

Scanned with CamScanner

তবু এমন লক্ষণার মাধ্যমেও মহৎ কাব্য সৃষ্টি হয় না। তার জন্য দরকার শব্দের অতিশায়িনী শক্তি—যা অভিধা, লক্ষণার পরিসর নয়। শব্দের সেই শক্তি আছে ব্যঞ্জনার মধ্যে। ব্যঞ্জনার শক্তি শব্দের মুখ্য অর্থ তো অতিক্রম করেই, এমনকি শব্দের দ্বারা লক্ষিত অর্থ অর্থাৎ লক্ষণাবৃত্তিকেও তা অতিক্রম করে। ব্যঞ্জনার শক্তি এমনই যাতে কবি-সাহিত্যিকের উচ্চারিত শব্দগুলি পদ-পদার্থের অতীত এর অলৌকিক অনুভূতি তৈরি করে। ব্যঞ্জনালব্ধ অর্থ সাধারণ শব্দার্থের মতো তো নয়ই, এমনকি এমনও হয়, যে ব্যবহৃত শব্দ উলটো অর্থও বোঝাতে পারে। আলঙ্কারিকরা যে শ্লোকটি উদ্ধৃত করেন, সেই 'ভ্রম ধার্মিক বিশ্রব্ধঃ'...শ্লোকে প্রেমিকের সঙ্গে নির্জনে মিলিত এক প্রেমিকা হঠাৎ ফুল কুড়োতে-আসা এক সাধুকে বলছে—সাধুবাবা! এখন আপনি নিশ্চিন্তে ফুল তুলতে পারেন। কেননা যে কুকুরটাকে আপনি খুব ভয় পেতেন, সেই কুকুরটাকে মেরে ফেলেছে গোদাবরীর বন থেকে বেরিয়ে-আসা এক সিংহ।

এই শ্লোকটি একটি বিধিসূচক বাক্য। বৃদ্ধ ধার্মিককে বিধিসূচক শব্দার্থের মাধ্যমে আশ্বস্ত করা হলেও এই শ্লোকের ব্যঞ্জনা একেবারে উলটো। অর্থাৎ এখনই পালাও। যে মানুষ কুকুর দেখে ভয় পায়, সেখানে এখন সিংহের ভয় উপস্থিত। অস্ত্যর্থক বিধিবাক্যের মাধ্যমে এখানে করণীয়তার নির্দেশ থাকলেও ব্যঞ্জনায় এখানে অকরণীয়তা বা নিষেধ বোঝাচ্ছে। শব্দের এই শক্তিই ব্যঞ্জনা, আনন্দবর্ধন-অভিনবগুপ্তরা যাকে বলেছেন 'ধ্বনি'। ব্যঞ্জনা যে সব সময় এমন

Scanned with CamScanner

উলটো অর্থই বোঝায় তা নয়, তবে এই উদাহরণ এই জন্য দেওয়া যে, ব্যঞ্জনার অর্থ কতদূর যেতে পারে। কবিতার মধ্যে এই ব্যঞ্জনার উদ্ভাস সুন্দরী রমণীর অঙ্গলাবণ্যের মতো। সমস্ত কবিতা-শরীরের মধ্যে ঢলঢলে ভাবে ভেসে বেড়ায় ব্যঞ্জনা--প্রতীয়মানং পুনরণ্যদেব...বিভাতি লাবণ্যমিবাঙ্গনাসু।

ধ্বনিবাদীদের মতে--অলঙ্কারও যান্ত্রিকভাবে প্রয়োগ করলে চলবে না, অলঙ্কারও ব্যঞ্জিত হওয়া চাই। যদি বলি--প্রবল পরাক্রান্ত বীরের দৃষ্টি প্রিয়তমার কুঙ্কুমরাগরঞ্জিত স্তনমণ্ডলের দিকে তেমন আকৃষ্ট হয় না, যেমনটি হয় শত্রুপক্ষের হাতির মাথায় সিঁদুরের রঙ দেখলে--তাহলে প্রিয়ার কুঙ্কুমরাগরঞ্জিত স্তনমণ্ডলের চেয়ে সিন্দুররাগরঞ্জিত শত্রুহস্তীর মস্তকের আকর্ষণ বীরের কাছে বেশি হওয়ায় ব্যতিরেক অলঙ্কার হল বটে, তবে ব্যতিরেকের এই যান্ত্রিকতা এখানে প্রধান নয়, এখানে প্রধান হল বীরত্বের ব্যঞ্জনা, যাতে রমণীর উত্তমাঙ্গের আকর্ষণ লঘু হয়ে যায় এবং শত্রুপক্ষের গর্বচিহ্নিত হাতির মাথার দিকে হত্যার দৃষ্টি ধ্বনিত হতে থাকে। অলঙ্কারধ্বনির পরেই বস্তুধ্বনির কথা বলেছেন ধ্বনিবাদী আলঙ্কারিকেরা। পূর্বোক্ত ফুল-কুড়োতে আসা বৃদ্ধ ধার্মিকের প্রতি নিভৃত মিলনকামিনী প্রেমিকের প্রস্তাবটা যতই ইতিবাচক থাকুক, রমণীর বস্তুগত বিবক্ষা যেহেতু উলটো, তাই এটাকে বলা যায় বস্তুধ্বনি।

ধ্বনির সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ রসধ্বনির মধ্যে। অর্থাৎ কাব্যের মধ্যে প্রকটভাবে রসের আমদানি ঘটবে না, রসকেও ব্যঞ্জিত হতে হবে। শুধু 'ভালবাসি ভালবাসি' বললেই শৃঙ্গার রস পুষ্ট হয় না, শৃঙ্গার রস ফুটে উঠবে ধ্বনির মাধ্যমে। কালিদাস লিখেছেন--মহর্ষি অঙ্গিরা যখন পিতা হিমালয়ের কাছে মহাদেবের জন্য তাঁর কন্যা পার্বতীকে প্রার্থনা করলেন, তখন পিতার পাশে দাঁড়িয়ে পার্বতী অধোমুখে কমল-কলির পাপড়ি গুনতে আরম্ভ করলেন--লীলাকমলপত্রাণি গণয়ামাস পার্বতী। এখানে কমলকলির পত্রগণনার কোনও অভিধেয় তাৎপর্য নেই। মহর্ষি অঙ্গিরার বৈবাহিক প্রস্তাবের সঙ্গে এই পত্রগণনার বা কী সম্পর্ক অথবা অন্বয় আছে? কিন্তু বিবাহের কথা শুনে পিতার পাশে দাঁড়ানো যুবতীর সমস্ত লজ্জা যখন ওই কমলকলির পত্রগণনার মাধ্যমে ব্যঞ্জিত হল, তখন শৃঙ্গার-রসটুকুও ধ্বনিত হল ব্যঞ্জনায়। রসধ্বনি বলে একেই।

শব্দ এবং পদের ব্যবহার বৈচিত্র্য শত শত রকমের ধ্বনির বিচার করেছেন আলঙ্কারিকেরা। যেগুলির বিবরণ পাওয়া যাবে মম্মটের *কাব্যপ্রকাশ*-এ, জগন্নাথের *রসগঙ্গাধর*-এ এবং অবশ্যই আনন্দবর্ধনের *ধ্বন্যালোক*-এ তথা অভিনবগুপ্তর *ধ্বন্যালোকলোচন* গ্রন্থে।

Scanned with CamScanner

রস

রস্যতে আস্বাদ্যতে ইতি রসঃ। অর্থাৎ যা আস্বাদন করা যায় তাই রস। পরম আস্বাদ্যতম ব্রহ্মানন্দকেই উপনিষদে রস বলে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং সেই রসের আস্বাদনে যে পরম আনন্দ লাভ হয় তাও ব্রহ্মানন্দী ব্যক্তির অনুভবসিদ্ধ। বস্তুত এই অপ্রাকৃত রসের ছায়াতেই প্রাকৃত রসের আস্বাদ্যমানতার কথা এসেছে। খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে ভরত *নাট্যশাস্ত্র* লেখার সময় রস সম্বন্ধে প্রথম সুনিপুণ ধারণা দিলেও পরবর্তী কালের আলঙ্কারিকেরা রস ব্যাপারটা ঠিক বোঝেননি। ফলে কেউ বলেছেন রস এক রকমের অলঙ্কার, কেউ বলেছেন এটি কাব্যের গুণ। একেবারে একাদশ শতাব্দীতে এসে অভিনবগুপ্ত যখন ভরতকথিত কাব্যরস এবং নাট্যরসের স্বরূপ ব্যাখ্যা করলেন *অভিনবভারতী* টীকায়, তখন রস সম্বন্ধে সম্যক ধারণার সৃষ্টি হল সামগ্রিকভাবে। অথচ ভরত সেই কবেই বলেছিলেন—রস ছাড়া কোনো বিষয় চলতেই পারে না—ন হি রসাদৃত কশ্চিদর্থঃ প্রবর্ততে। হয়ত এই কথাটার ওপরে নির্ভর করেই নবম খ্রিষ্টাব্দে ধ্বনিকার আনন্দবর্ধন লিখেছিলেন—এমন কোনো বিষয়ই থাকতে পারে না, যা রসের স্পর্শ পেলে চমৎকার না হয়ে ওঠে—নাস্ত্যেব তদ্‌বস্তু যদভিমত রসাঙ্গতাং নীয়মানং ন প্রথতে।

ভরতমুনিই প্রথম দেখিয়েছিলেন যে কাব্য-নাটকের মধ্যে রস তৈরি হওয়ার একটা নির্দিষ্ট উপায় আছে। পারিভাষিকভাবে বলা যায়—মানুষের ভিতরে নিরন্তর কতগুলি স্থায়ীভাব তাকে সুখিত করে, দুঃখিত করে, তাকে হাসায়, রাগায়, উৎসাহিত করে। ভরতের মতে মনোজগতের এই স্থায়ী ভাব আটটা—রতি, হাস্য, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, ঘৃণা এবং বিস্ময়। এই স্থায়ী ভাবগুলিই যখন বিভাব, অনুভাব এবং ব্যভিচারী ভাবের মাধ্যমে কাব্য-নাটকে অভিব্যক্ত হয়ে ওঠে তখনই তাতে রসের সৃষ্টি হয়—তত্র বিভাবানুভাব-ব্যভিচারী সংযোগাদ্ রসনিষ্পত্তিঃ। বিভাব হল স্থায়ী ভাবের কারণ। ধরুন—মনের মধ্যে যে চিরন্তন রতি বা মিলনেচ্ছা আছে তা নায়ক এবং নায়িকাকে অবলম্বন করেই সৃষ্টি হয়। এই নায়ক-নায়িকা হলেন আলম্বন বিভাব। আবার যে-সব জিনিস নায়ক-নায়িকার মিলনেচ্ছা চেতিয়ে দেয়—নির্জন নদীতীর, কোকিলের ডাক, বসন্তের হাওয়া—এগুলি হল উদ্দীপন বিভাব। অনুভাব হল স্থায়ীভাবের কার্য, যেমন

Scanned with CamScanner

দীর্ঘশ্বাস, কটাক্ষ, অঙ্গভঙ্গি ইত্যাদি। স্থায়ীভাবের সহকারী যে ভাবগুলি তাকে বলে ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাব। যেমন মিলনেচ্ছা বা ভালবাসার ক্ষেত্রে চিন্তা, উদ্‌বেগ, লজ্জা, হর্ষ, দীনতা, আবেগ, স্মৃতি ইত্যাদি। ভরতের মতে—আটটি স্থায়ীভাব—রতি, হাস্য, শোক ইত্যাদি বিভাব, অনুভাব এবং ব্যভিচারী ভাবের সংযোগে আটটি রসের সৃষ্টি করে যথাক্রমে—শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস এবং অদ্ভুত রস।

কাব্য-নাটকের মধ্যে যে রস কাব্যের শ্রোতা বা নাটকের দর্শক অনুভব করে, সেখানে দর্শক-শ্রোতার মনোলোকই প্রধান। রসশাস্ত্রকারদের মতে সামাজিকের মনের মধ্যে শৃঙ্গার, শোক, ক্রোধ ইত্যাদি ভাব পূর্বজন্মের সংস্কারের মতো বাসনাবদ্ধ অবস্থায় থাকে। অভিনয় দেখা বা কাব্য পড়ার সময় কাব্য-নাট্যগত বিভাব-অনুভাবগুলির সঙ্গে প্রথমে সামাজিকের হৃদয় এক ধরনের একরূপতা লাভ করে। এই তন্ময়ীভবনের প্রক্রিয়ায় সামাজিকের হৃদগত স্থায়ীভাব উদ্রিক্ত হয়। এই বাসনালোক জাগ্রত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভাব-অনুভাবের বোধগুলি অপ্রধান হতে শুরু করে এবং ভাবতন্ময় চিত্তে অলৌকিক এক রসের আস্বাদন অনুভূত হয়। এই আস্বাদন স্থায়ীভাবেরও আস্বাদন নয় আবার বিভাব-অনুভাবাদিরও আস্বাদন নয়। পোলাও তৈরি করবার সময় গোবিন্দভোগ চালটিকে যদি স্থায়িভাব হিসেবে ধরা যায়, সেখানে তার বিভাব, অনুভাব, সঞ্চারী হিসেবে ধরা যায় জায়ফল, শাহমরিচ, কিশোরী রং থেকে আরম্ভ করে ক্ষুধা এবং নিমন্ত্রণের উপলক্ষ্য পর্যন্ত। কিন্তু পোলাও খাবার সময় যেমন আলাদা করে জায়ফল-জৈত্রির স্বাদ পাওয়া যায় না, কিংবা পাওয়া যায় না গোবিন্দভোগ চালের নিজস্ব স্বাদও, ঠিক তেমনই রতি, শোক ইত্যাদি স্থায়ীভাব তাদের নিজস্ব বিভাবাদির সংযোগে এমন এক বিলক্ষণ আস্বাদন তৈরি করে, যাতে সামাজিকের হৃদয়ে বিলক্ষণ এক রসানুভূতির সৃষ্টি হয়, যেখানে বিভাবাদির পৃথক উপস্থিতি আর টের পাওয়া যায় না।

প্রাচীন ঐতিহ্য অনুযায়ী রস আট রকমের হলেও পরবর্তী আলঙ্কারিকেরা নবম রস হিসেবে যোজনা করেছেন শান্তরসকে। ব্রহ্মানন্দী ঋষিরা কামক্রোধাদিবর্জিত নিস্তরঙ্গ হৃদয়ে যে অলৌকিক ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ আনন্দ অনুভব করেন, সেটাও যে রসপদবাচ্য হওয়া দরকার, সেটা পরবর্তী আলঙ্কারিকেরা অনুভব করেছেন। আরো পরবর্তীকালে ভক্তিরসকেও অন্যতম প্রধান রস হিসেবে গ্রাহ্য করার দাবি ওঠে রসশাস্ত্রবিদ পণ্ডিত-সজ্জনের মনে। একালে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও ক্ষুব্ধ ছিলেন প্রাচীন রসশাস্ত্রের ঐতিহ্যে ভক্তিকে রস বলে গ্রাহ্য করা হয়নি বলে। তবে অতিপ্রাচীনেরা যাই করে থাকুন, চৈতন্যপরবর্তী যুগে চৈতন্য-পার্ষদ রূপ গোস্বামী রসশাস্ত্রের রূপটাই পরিবর্তন করে দিয়েছেন। তাঁর মনে—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর—এই পাঁচটিই প্রধান রস। এই মতের অনুগামী হয়ে কবিকর্ণপুর *অলঙ্কারকৌস্তুভ* রচনা করেছেন। কৃষ্ণভক্তিই এই রসসম্প্রদায়ের প্রধান উপজীব্য এবং ঐতিহ্যানুগত প্রাকৃত অষ্টরস এই রসের ছায়া মাত্র।

ঐতিহ্যবাহী অষ্টরসবাদীদের মতে মূল রস চারটি। যেমন শৃঙ্গার-রসের অনুকরণই হাস্য। বৃদ্ধ পুরুষ যদি যুবকের মতো সেজে তরুণীর কাছে প্রেম নিবেদন করে, তবে বলতে হয় শৃঙ্গারের অনুকরণই হাস্যরস। আরেকভাবে রৌদ্ররসের কর্মই করুণ-রস। কর্ম অর্থ ফল। রৌদ্র-রসের ফল বধ-বন্ধন প্রভৃতি। আর এমন বধ কিম্বা বন্ধন ঘটলেই করুণ-রসের সৃষ্টি হয়। একইভাবে বীররসের ফলই হল অদ্ভুতরস। ধরুন, রামচন্দ্র রাবণের সঙ্গে যুদ্ধকালে এমনভাবেই রাবণকে মারলেন, যাতে পাঠকের মনে বিস্ময় তৈরি হয়। এই বিস্ময়ের স্থায়ীভাব থেকেই অদ্ভুতরসের সৃষ্টি। আর বীভৎস যেখানে আছে, ভয়ানক-রসও সেখানেই থাকে—এটাই রসশাস্ত্রকারদের ধারণা।

Scanned with CamScanner

রসতত্ত্ব সম্বন্ধে যে সব গ্রন্থে গভীর আলোচনা আছে, সেগুলি হল--ভরতের *নাট্যশাস্ত্র*, তদুপরি অভিনবগুপ্তের টীকা *অভিনবভারতী*। আনন্দবর্ধনের *ধ্বন্যালোক*, তদুপরি অভিনবগুপ্তের টীকা *ধ্বন্যালোক-লোচন*। পণ্ডিতরাজ জগন্নাথের *রসগঙ্গাধর*, মম্মটভট্টের *কাব্যপ্রকাশ*, বিশ্বনাথের *সাহিত্যদর্পণ*, রূপগোস্বামীর *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* এবং *উজ্জ্বলনীলমণি*, তথা পরমানন্দ সেন কবিকর্ণপুরের *অলঙ্কারকৌস্তুভ*।

Scanned with CamScanner